দৈনিক বাংলা

তারিখ 06 NOV 1984
পৃষ্ঠা... বিশেষ ... কলাম ... ...

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

বাংলা শিশু পাঠ্য বইঃ প্রণয়নরীতি ইতিহাস

মনসুর মুসা

উপরন্তু বাংলা শিশু পাঠ্য বই রচনার ইতিহাস আধুনিক পাঠশালা প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মধ্যযুগে শিশু শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু সে ব্যবস্থা যতটা না পুঁথি নির্ভর ছিল তার চেয়ে বেশী ছিল গুরু-নির্ভর। গুরুগৃহ ছিল শিশুশিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র। গুরু শিষ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী কিংবা মেধা অনুযায়ী পাঠ্য বিষয় নির্ধারণ করে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষাদান করতেন। ইংরেজ আমলে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে গুরু কেন্দ্রিক পাঠশালা ব্যবস্থা পুস্তক কেন্দ্রিক পাঠশালা ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়। পুস্তক কেন্দ্রিক পাঠশালা ব্যবস্থার যুগে শিশু শিক্ষার বই প্রণয়নের চিন্তা-ভাবনা পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

শিশুশিক্ষা মানব জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ। শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার উপর পরবর্তী শিক্ষার সৌধ নির্মিত হয়। সে জন্য শিশুশিক্ষার গুরুত্ব সকল দেশে স্বীকৃত। দেশে উপযুক্ত মানবসম্পদ গড়ে তোলার সর্ববিধ উপায়ের মধ্যে এ কারণেই সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্য পুস্তক রচনার সঙ্গে শিশু মনোবিজ্ঞান উপলব্ধির শর্ত জড়িত। সব বই শিশুদের পাঠ করতে দেওয়া যায় না। সব বই সব বয়সের উপযোগী হয় না। সে জন্য বয়ঃক্রম অনুসারে পাঠক্রম নির্ধারিত হওয়া উচিত।

বাঙলা শিশু পাঠ্য পুস্তক রচনারীতির জন্য কোনো প্রশিক্ষণ পদ্ধতি নেই। বাঙলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড যে পদ্ধতিতে শিশু পাঠ্য পুস্তক রচনা করে এসেছে তাকে এক কথায় সংকলন পদ্ধতি বলা যায়। সাধারণত একাধিক শিক্ষাবিদকে এক একটি শ্রেণীর এক একটি বই প্রস্তুত করার দায়িত্ব দেয়া হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ একটি কমিটির পরামর্শক্রমে একাধিক লেখকের রচনা সংগ্রহ করে অথবা একেকজন লেখককে দিয়ে এক-একটি প্রবন্ধ বা বিষয় লিখিয়ে একসঙ্গে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। শিক্ষাক্রমে বর্ণিত বিষয়াবলীই সাধারণত পাঠের জন্য নির্বাচন করা হয়। প্রতিটি বই প্রস্তুত করার পেছনে অনেক শিক্ষাবিদ কিংবা লেখকের সম্মিলিত মেধা প্রয়োগ করা হয়। এতে অবশ্য 'অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়' কিনা ভাবনার বিষয় আছে। তবে একাধিক মত ও পথ, একাধিক আদর্শ ও রীতির সমন্বয় বিধান করতে গিয়ে শিশুর মৌলিক প্রয়োজনের দিক থেকে মনোযোগ অন্যত্র সরে যাওয়ার আশংকা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমাদের শিশু পাঠ্য বিজ্ঞানের বই ও ধর্মীয় শিক্ষার বইতে বহু পরস্পর সংঘাতমুখী চিন্তা-চেতনার প্রশ্রয় আছে। শিশুর জন্য এসব বাস্তবতা ও আদর্শ শিক্ষণ কতটা প্রয়োজন তা পুনর্বিচার করা যেতে পারে।

শিশু শিক্ষার গোড়াতেই ভাষা ও অংক শেখানোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সেক্ষেত্রে ভাষার বুনিয়াদ শক্ত করার লক্ষ্যই হওয়া উচিত শিশু গ্রন্থের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। অন্যান্য আদর্শ গৌণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য আদর্শগত বিবেচনা মুখ্য হয়ে গেলে ভাষা শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হয়ে যাবে। সংকলন পদ্ধতির পাঠ্য পুস্তকের তাৎপর্য পরিকল্পিত ভাষা শিক্ষণ বইর চেয়ে কোনোক্রমেই অগ্রগণ্য হতে পারে না। বাঙলা পাঠ্য পুস্তক রচনার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ভাষার অগ্রগণ্যতার উদ্দেশ্য নানা কারণে বিভিন্ন সময়ে পর্যুদস্ত হয়েছে। আমাদের ভাষাগত দুর্বলতার কারণ হয়ত ওখানেই অনুসন্ধান করা যাবে।

শিশুশিক্ষা ও পাঠ্যপুস্তক রচনার ইতিহাস

বাঙালী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা সাম্প্রতিককালে হয়েছে—এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। কারণ পাঠশালায় প্রেরণ করে শিশুদের বিদ্যাভ্যাস করাবার রেওয়াজ মধ্যযুগেও প্রচলিত ছিলো। পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে রচিত বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়ে' লখীন্দরের চৌত্রিশ অক্ষর ও আঠারো কলা শেখার উল্লেখ আছে। ষোড়শ শতকের নদীয়ার টোল ও পাঠশালা যে কতটা ব্যাপক ছিলো তা শ্রী চৈতন্যের জীবনী থেকে জানতে পারি। শ্রী চৈতন্য নিজেও পাঠশালায় অধ্যাপক ছিলেন। চন্ডীমঙ্গল কাব্যে (রচনাকাল ১৫৯৪-১৬০৬) শ্রী মন্তের বিদ্যারম্ভ অংশে তৎকালীন প্রাথমিক শিক্ষাদান ব্যবস্থার যৎসামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রী মন্তকে শুভক্ষণে 'হাতে খড়ি' অনুষ্ঠানের পরে গুরুর পাঠশালায় পাঠানো হলো। গুরুকে মাসিক পঞ্চাশ কাহণ কড়ি বেতন দিতে হয়। শ্রী মন্ত প্রথমে আঠারো কলা অর্থাৎ ক খ অক্ষ আঙ্ক ইত্যাদি শিক্ষালাভ করলো। তারপর বর্ণের উচ্চারণ শুনে বুঝতে শিখলো আর উচ্চারণ অভ্যাস করে পড়তে শিখলো। ক্রমে শ্রীমন্ত সাহিত্য ও অলংকার পড়তে শুরু করলো। এ ধারার শিক্ষাপদ্ধতি অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ছিলো। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষার ইতিবৃত্ত থেকেও শিক্ষা ব্যবস্থার সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কি ধরনের পাঠ্য উপকরণ ব্যবহৃত হতো জানা যায় না। স্কুল সোসাইটির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে তখন কোনোও স্কুলে কোনোও মুদ্রিত বই পড়ানো হতো না। কোনোও মতে বর্ণমালা, সংখ্যা পাঠ ও মোটামুটি অংকশাস্ত্র শিখিয়ে দেওয়া হতো। সর্দার পড়ুয়া হাঁক দিয়ে, অন্যরা হল্লা করে তা-ই আওড়াতো। অবশ্য ছাত্ররা প্রথমে মাটির তৈরি খড়ি দিয়ে তারপর তালপাতা অক্ষরে নকশা করতো। মুখে মুখে মুখস্ত করানো হতো চাণক্য শ্লোক। বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুদ্রণযন্ত্র প্রবর্তিত হওয়ার পর শিশু পাঠ্য পুস্তক রচনার সূত্রপাত হয়।

নতুন ভাবে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশনে পাঠ্য পুস্তক রচিত হয়েছিল কিন্তু সেসব পাঠ্য পুস্তকের লক্ষ্য স্বদেশীয় শিশু শিক্ষার্থী নয়, বিদেশীয় বয়স্ক শিক্ষার্থী। এসব পাঠ্য পুস্তকের ব্যবহারও ছিল সীমাবদ্ধ। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে আরো একটি ঘটনা ঘটে। শ্রীরামপুরের মিশনারিরা ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দিকদর্শন নামে একটি ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকা বের করে। এতে ভূগোল, ইতিহাস। নানা দেশের জ্ঞাতব্য তথ্য সরস ও কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী প্রকাশিত হতো। দিকদর্শনের ভাষা ও বিষয়বস্তু উভয়ই ছিলো বিদ্যালয়ে ব্যবহারের উপযোগী। সে জন্য স্কুল বুক সোসাইটির বিদ্যালয়গুলোতে দিকদর্শন পাঠ্য পুস্তক হিসেবে প্রচলিত ছিল। শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্য পুস্তক রচনা শুরু হয় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে। সে বছর জানুয়ারীতে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু কলেজ আর মে মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় স্কুল বুক সোসাইটি। আর তার পরের বছর ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাইয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা স্কুল সোসাইটি। দুটো প্রতিষ্ঠান শিশুদের জন্য পাঠ্য পুস্তক রচনা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে।

কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ১৮১৭, ৪ঠা জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা সরকারী প্রতিষ্ঠান ছিল না। কলকাতার ইংরেজ হিন্দু ও মুসলমান ব্যক্তিবর্গ নানাদেশীয় বিদ্যা বিষয়ক পুস্তকাদি এতদ্দেশীয় ভাষাতেও অক্ষরে প্রস্তুত করার জন্য সমবেতভাবে এ প্রতিষ্ঠান গঠন করেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁরা চাঁদা প্রদান করে এর জন্য অর্থ সংস্থান করেছিলেন।

সোসাইটির পরিচালনভার স্যার এডওয়ার্ড হাইড ঈস্ট, জে এইচ হ্যারিংটন, ডবলিউ বি বেলী উইলিয়ম কেরী, তারিনী চরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রমুখের উপর ন্যস্ত ছিল। স্কুল সোসাইটিও প্রায় অনুরূপ প্রতিষ্ঠান। এটি ডেবিড হেয়ারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ প্রতিষ্ঠানের জন্য লখনৌ-এর নবাব এক হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন। এতেও ইংরেজ, হিন্দু ও মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব ছিলো।

তবে স্কুল সোসাইটির অনেকেই বুক সোসাইটির সদস্য ছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব স্কুল সোসাইটির দেশীয় সেক্রেটারী ছিলেন আর ডেবিড হেয়ার ছিলেন ইউরোপীয় সেক্রেটারী। স্কুল বুক সোসাইটির অন্যতম লক্ষ্য ছিলো পাঠ্য বই লেখানো এবং সেগুলো ছেপে সস্তায় বা বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দেওয়া। স্কুল সোসাইটি অনেকটা প্রথম সোসাইটির পরিপূরক ছিলো। পাঠশালার উন্নতি সাধন, আদর্শ ইংরেজী ও বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা আর মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

স্কুল বুক সোসাইটি নানা ধরনের অসংখ্য বই ছেপেছে। ১৮১৭ থেকে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এক লক্ষেরও বেশি বই বিক্রি বা বিলি করেছে কলকাতা ও মফস্বলের স্কুলগুলোতে। পাঠ্য বইয়ের বাজার তখন পুরোপুরি স্কুল বুক সোসাইটির দখলে ছিলো। নিখিল সরকার বলছেন—ওঁরা পরিকল্পনা করে উচ্চ মানের বই লেখাতেন, যত্ন করে ছাপাতেন। বইয়ের দামও রীতিমত সস্তা। অনেক ক্ষেত্রে ওঁরা বাইরে থেকেও পান্ডুলিপি সংগ্রহ করতেন। কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ত সুপারিশ করে করেও বইয়ের পান্ডুলিপি পাঠালেন, অনেক সময় সোসাইটি বিচার বিবেচনা করে সেটি গ্রহণও করতেন। অনেক সময় পাঠ্যবই লেখার জন্য পুরস্কারও দেয়া হত। তাছাড়া সোসাইটি নগদ অর্থের বিনিময়ে

06 NOV 1988

'কপি রাইট' কিনতেন। কখনও হয়ত অন্যের প্রকাশিত কোনও উচ্চমানের বই বেশ কিছু কপি কিনে ছিলেন। এক কথায় যে-ভাবে পারা যায় ভাল পাঠ্য বই প্রকাশ এবং বিতরণেই সেদিন উৎসর্গীকৃত সোসাইটির প্রাণ। স্কুল বুক সোসাইটি পাঠ্যপুস্তক রচনার ভাষা সম্বন্ধে কোনো নীতিমালা বা নির্দেশমালা গ্রহণ করেছিলো কিনা জানা যায় না। তার মৌলিক রচনার চেয়ে অনুবাদ মূলক পাঠ্যপুস্তকই তখন বেশী ছিলো বলে মনে হয়।

তৎকালে প্রকাশিত ভাষা সম্পর্কিত পাঠ্যপুস্তকের একটি অসম্পূর্ণ তালিকা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

রাধাকান্ত দেব—বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ
" —ধারাপাত
কীথ —বাংলা ব্যাকরণ (১৯ সংস্করণ)
স্টুয়ার্ট —উপদেশকথা
" বাংলা লিপিমালা
ব্রজকিশোর গুপ্ত—বঙ্গভাষা ব্যাকরণ
পিয়ার্সন —বাক্যাবলী
" —অভিধান
রামকমল বিদ্যালঙ্কার—ধাতুবিবেক

'শিশুর বর্ণপরিচয় যাতে সুনিশ্চিত হয় তার জন্যে স্বর ও ব্যঞ্জনের স্বাভাবিক ক্রমের পরেই দেয়া আছে এগুলির বিপর্যস্ত ক্রম এবং বিপর্যস্ত ঘটানো হয়েছে যথাসম্ভব বর্ণলিপির আকৃতি অনুসারে। যেমন—ব র ক থ ঋ। এই বিপর্যস্তক্রমের উপরে নির্দেশ আছে—'স্লেট অথ কাষ্ঠফলকে নিম্নলিখিত ধারা অনুসারে বর্ণপাতায় করাইবেন।' তার পরে আছে শুধু অকারান্ত শব্দ পাঠ। এক্ষেত্রেও সুচিন্তিত ক্রমানুসরণের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, প্রথমে কর কর, থল থল, তার পরে হল-ধর। চল ঘর, পদ্ম-তল, শত-দল এবং সর্বশেষে আছে জল-শয়ন। ফল-চয়ন, শমন ভয় দমন হয় ইত্যাদি। দ্বিতীয় পাঠে প্রথমে আকার, ইকার প্রভৃতি স্বরবর্ণ সংযোগের বিভিন্ন রূপ দেখিয়ে প্রচুর দৃষ্টান্তযোগে শিশুদের বহু সহজ শব্দ পাঠে আকৃষ্ট করার প্রয়াস দেখা যায়। এ দৃষ্টান্তগুলিরও বহু পর্যায়। যেমন—কাল কাক, তাল নাক, দান চার, মান যার, মালা গাঁথি গলে পরি, বাঁশি বাজে গান করি, পবন বইছে, ভবন দহিছে। এভাবে সরল শব্দ পাঠে অভ্যস্ত করিয়ে শিশুদের নিয়ে যাওয়া হল সরল

দৈনিক বাংলা
বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
06 NOV 1985

কের আলোকে আলোচনাটি হাজির করেছেন। বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তক সমস্যা সে বিতর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় বলে আমরা ১৯৪৭ পরবর্তী পাঠ্যপুস্তক রচনার ইতিবৃত্ত তুলে ধরতে চাই।

বৃটিশ যুগ থেকে পাকিস্তানী আমলে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

স্কুল বুক সোসাইটির পরবর্তী ইতিহাস সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু জানা যায় না, তবে বৃটিশ ভারতের অখন্ড বাংলায় প্রাদেশিক টেক্সট বুক কমিটি নামে একটি কমিটি জনশিক্ষা পরিচালকের সভাপতিত্বে কার্যকর ছিলো। কমিটিতে ৩৬ জন সদস্য ছিল। কমিটির কাজ ছিল পরামর্শ প্রদান করা। কমিটি চারটি কাজ করতো:

(ক) মাধ্যমিক স্কুল, প্রাথমিক স্কুল ও মক্তবের জন্য পাঠ্যবই সুপারিশ করা

(খ) লাইব্রেরী ও পুরস্কারের জন্য বই সুপারিশ করা,

(গ) জনশিক্ষাপরিচালক কর্তৃক উত্থাপিত পাঠ্যবই সংক্রান্ত যেকোন বিষয় রিপোর্ট করা,

(ঘ) কমিটির সদস্যদের মতানুযায়ী যদি প্রচলিত কোন বই অনুপযোগী বিবেচিত হয় বা প্রয়োজনীয় বই যদি পাওয়া না যায়, তবে নতুন বই তৈরির প্রস্তাব প্রদান।

এ ধরনের ব্যবস্থা পাকিস্তান পরবর্তী সময়েও চালু ছিল। ৩৬ সদস্য বিশিষ্ট এ ধরনের একটি কমিটির কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত না হওয়া ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের সার্জেন্ট রিপোর্ট অনুযায়ী পাকিস্তান পরবর্তীকালে ৫ থেকে ৭ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব হয়। সেই অনুযায়ী তৎকালীন প্রাদেশিক সরকার পূর্বতন টেক্সট বুক কমিটি বিলোপ ঘোষণা করে ১৯৫৪ সনে দি ইস্ট পাকিস্তান স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড গঠন করে। (১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ×সংখ্যা আইন) ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে আরেক আইন বলে কমিটি সদস্য সংখ্যা ৫ জন থেকে ১৫ জনে উন্নীত হয়। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের আইন অনুযায়ী বোর্ডের নিম্নলিখিত কার্যক্রম নির্ধারিত হয়:

নতুন কারিকুলাম কমিটি

মুসলমানদের স্বাতন্ত্র চেতনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানের অনেক জরুরী প্রয়োজনের মধ্যে নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের প্রয়োজন ও তীব্রভাবে দেখা দেয়। কারণ পাকিস্তান পূর্বকালের পাঠ্যবই রাজনৈতিক বা আদর্শিক দিক থেকে নতুন রাষ্ট্রের নতুন নাগরিক গড়ার উপযোগী ছিল না। ফলে ১৯৫৪ সনের শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৬০ খৃঃ নতুন রাষ্ট্রীয় আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করার জন্য একটি কারিকুলাম কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি ১ম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের উপযোগী একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। ফলে কারিকুলাম কমিটির নির্দেশিত প্রস্তাব অনু- [illegible]

বোর্ডের ওপর। এ ব্যবস্থা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্বে পর্যন্ত বলবৎ থাকে।

বাংলাদেশ আমল

১৯৭১ খৃষ্টাব্দে পাকিস্তান রাষ্ট্র ভেঙ্গে যায় এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার নতুন রাষ্ট্রের নতুন আদর্শগত প্রয়োজন প্রধান হয়ে দেখা দেয়। পাকিস্তান আমলের পাঠ্যবই অনুপযোগী বিবেচিত হয়। ফলে ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দের নবেম্বরে ন্যাশনাল কারিকুলাম ও সিলেবাস কমিটি গঠিত হয়। আরেক প্রস্থ নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের প্রয়োজন ও দায়িত্ব দেখা দেয়। এই উত্থান পতনের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে গবেষণা করার কোনো উপায় ছিল না। পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে গবেষণার জন্য ১৯৮০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে ন্যাশনাল কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এর কাজ শুরু করতে না করতেই ১৯৮২তে দেশে সামরিক অভ্যুত্থান হয় এবং সামরিক নির্দেশ অনুযায়ী ন্যাশনাল কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে একত্রীকরণের পর্যায় সূচিত হয়। ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দের এক আইন বলে ন্যাশনাল কারিকুলাম ও টেক্সট বুক বোর্ড একত্রিত হয়ে (২রা অক্টোবর ১৯৮৩) বর্তমান সংস্থাটির আবির্ভাব ঘটে।

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি

বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নতুন রাষ্ট্রের আদর্শের ভিত্তিতে নতুন পাঠ্যসূচী প্রণীত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। বিশেষ করে পাকিস্তানযুগের ধ্যান-ধারণা ও বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গী পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় ইস্ট পাকিস্তান স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের প্রয়োজনীয় সংযোজন বিয়োজন করে বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড পুনর্গঠিত হয়। এই সংস্থাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। কমিটি ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বরে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে একটি বিস্তারিত সুপারিশ পেশ করে। (বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি রিপোর্ট প্রথম খন্ড: প্রাথমিক স্তর)।

এই রিপোর্টে পাঠ্যপুস্তকের ভাষা ও বানানরীতি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনার নির্দেশনাসমূহের মধ্যে দুটো ছিলো নিম্নরূপ:

(ক) বয়স ও স্তর ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর শব্দজ্ঞান এবং বাক্য গঠন প্রণালীর উপর জরীপ পরিচালনা করে শিক্ষার্থীর শব্দভান্ডারের ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে।

(খ) ১ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচনার পর [illegible] মান ও [illegible]

শিশু-পাঠ্য বই

(বিঃ সঃ ৩য় পৃষ্ঠার পর)

২য় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক এবং এ রীতি অনুসারে তৃতীয় এবং পরবর্তী শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচনা করা বাঞ্ছনীয় হবে। (পৃঃ ৩৫)

প্রতিবেদনের সুপারিশ যদি বাস্তবায়ণ করা সম্ভব হয়, তবে বাংলা শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনার ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগমন সাধিত হবে।

বাংলা ভাষায় পাঠ বা টেক্সট-এর কমতি নেই, কিন্তু কোন পাঠ কোন ক্ষেত্রে উপযুক্ত হবে, ফলপ্রসূ হবে কিংবা ক্ষতিকর হবে এটা নির্ধারণের কোন মাপকাঠি নেই। তার জন্য শিশু মনোবিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানী ও ভাষাবিজ্ঞানীকে যৌথভাবে কাজ করতে হবে। পাঠ মূল্যায়ণ (Text Evaluation) শুধুমাত্র কান্ডজ্ঞানের উপর ছেড়ে দিলে পাঠ্য বইতে স্তরক্রমিক উপযোগিতা রক্ষিত হবে না।

বাংলা শিশু পাঠ্যবই রচনার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা হবে এ আশা আর হয়তো দুরাশা বলে প্রতীয়মান হবে না।

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 02 FEB 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

মায়ুর বিদ্যালয় গমন ও শিক্ষকের ভূমিকা

ডঃ মালিহা খাতুন

মায়ের কোল আলো করে যখন শিশু আসে, তখন মায়ের স্নেহ-সমুদ্র উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, আর পিতার বুক আপ্লুত হয়ে ওঠে এক অলৌকিক বাৎসল্য রসে। শিশু মর্ত্যের আলোকে তার বিস্মিত দু'টি সুন্দর কচি চোখ মেলে দেয়। মায়ের স্নেহমাখা মুখের দিকে চেয়ে, তার মুখের অমৃত ভাষা শুনে, শিশু আপনার ক্ষুদ্র অস্তিত্ব ও পরিবেশ সম্বন্ধে নানাভাবে সচেতন হয়ে ওঠে। কিছুকাল পরেই তার মুখে মিষ্টিমধুর বোল ফোটে। এই বোল ফোটার মধ্যে তার প্রকাশের প্রথম ব্যাকুলতা ধরা পড়ে। তার পর তার নিকট পরিবেশের সঙ্গে তার পরিচয় শুরু হয় দেখা, শোনা ও কথা বলার চেষ্টার মধ্য দিয়ে। ক্রমেই সে জানতে চায়, বুঝতে চায়, দেখতে চায়, হতে চায়!... কিন্তু তার মা-বাপ তাকে অত জানাতে, বোঝাতে, দেখাতে ও হতে দিতে পারে না। তাই কৌতূহলী, ক্রীড়াচঞ্চল, স্নেহের পুতুলীকে একদিন পিতা হাত ধরে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসে শিক্ষকের কাছে। উদ্দেশ্য শিক্ষক তার সকল প্রশ্নের উত্তর দেবেন, তার ভিতরকার সম্ভাব্য মানুষটিকে ধীরে ধীরে বিকশিত করে পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে গড়ে তুলবেন।...

শিশু এতদিন তার স্নেহময়ী মা, স্নেহশীল পিতা ও আত্মীয়-পরিজনের স্নেহচ্ছায়ায় লালিত হয়ে আসছে। আজ তাঁদের ক্রোড়চ্যুত হয়ে হঠাৎ এক অপরিচিত পরিবেশে এসে উপস্থিত হয়েছে। শিশুর এই সময়কার মনোভাব তথা মনোবেদনা বোঝানোর ব্যাপার নয়, কেবল হৃদয় দিয়ে উপলব্ধির ব্যাপার শিক্ষক এই সময় তাকে কতখানি আপন করে গ্রহণ করতে পারেন, আরই ওপর নির্ভর করে শিশুর বিদ্যালয়ের অবস্থানের আনন্দ-বেদনা। শিক্ষক যতই বর্ষীয়ান হন না কেন, তাঁকে তখন নেমে শিক্ষার জন্য শিশু বিদ্যালয়ে এসেছে, কিন্তু শিক্ষা জিনিসটা জৈব, যান্ত্রিক নয়। উভয়ের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক থাকা চাই, নইলে দেনা-পাওনায় নাড়ীর যোগ স্থাপিত হয় না। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি মূল্যবান বক্তব্য স্মর্তব্য : 'যে গুরুর অন্তরের ছেলে-মানুষটি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়েছে, তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য। যিনি জাত-শিক্ষক, ছেলেদের ডাক শুনলেই তাঁর ভিতরকার আদিম ছেলেটা বেরিয়ে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয় প্রাণভরা হাসি।'

এই যদি হয় শিক্ষকের হৃদয়-ধর্ম, তা হলে বিদ্যাগারকে শিশুরা কারাগার মনে করবে কেন? শিশু বিদ্যালয়ে আসার সঙ্গে তাকে সর্বাগ্রে সকল রকম কৃত্রিমতা থেকে দিতে হবে মুক্তি। বিদ্যালয়ের পরিবেশটি হবে শিশুর গৃহের চেয়েও আকর্ষণীয়। খেলা-ধুলা, নাচ-গান, বাদ্যের তালে তালে খানিকটা ড্রিল, ছড়া, গল্প, রূপকথা বলা, বন ভোজন, রঙ-বেরঙের দৃশ্যের ছবি দেখানো ইত্যাদি ব্যবস্থা চলতে থাকবে সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনায়। মনে রাখতে হবে, শিশুরা বিশ্ব প্রকৃতির অত্যন্ত কাছের। আরাম কেদারায় তারা আরাম চায় না, সুযোগ পেলেই গাছের ডালে চড়তে চায়।—তাই বিশ্ব-প্রাণের স্পন্দন লাগতে দিতে হবে তাদের মরা দেওয়ালগুলোর বাইরে। মাঝে মাঝে তাদের নিয়ে যেতে হবে একটু একটু করে দূরে—বাইরের জগতে। আনন্দে-কৌতূহলে তাদের মন ভরে দিয়ে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশটি আগে গড়ে নিতে হবে। তারপর শিক্ষা—অতি সন্তর্পণে, শিশু-মনস্তত্ত্বকে অনুসরণ করে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আরেকটি মূল্যবান উক্তি স্মরণীয় : 'শিশু যে অ্যালজেব্রা না করিয়াই, ইতিহাসের তারিখ না মুখস্থ করিয়াই, মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সেজন্য সে কি অপরাধী? তাই সে হতভাগ্যদের নিকট হইতে তাহাদের আকাশ-বাতাস, তাহাদের আনন্দ-অবকাশ সমস্ত কাড়িয়া লইয়া শিক্ষাকে সর্বপ্রকারেই তাহাদের পক্ষে শাস্তি করিয়া তুলিতে হইবে? না জানা হইতে ক্রমে ক্রমে জানিবার আনন্দ পাইবে বলিয়াই কি শিশুরা অশিক্ষিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে না? আমাদের অক্ষমতা ও বর্বরতাবশতঃ জ্ঞানশিক্ষাকে যদি আমরা আনন্দময় করিয়া না তুলিতে পারি, তবু চেষ্টা করিয়া ইচ্ছা করিয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরতাপূর্বক নিরাপরাধ শিশুদের বিদ্যাগারকে কেন আমরা কারাগারের আকৃতি দেই? শিশুদের জ্ঞান শিক্ষাকে বিশ্ব-প্রকৃতির উদার রমণীয় অবকাশের মধ্যে দিয়া উন্মোচিত করিয়া তোলাই বিধাতার অভিপ্রায় ছিল—সেই অভিপ্রায় আমরা যে পরিমাণে ব্যর্থ করিতেছি, সেই পরিমাণেই ব্যর্থ হইতেছি।' বস্তুতঃ শিশু সারাদিন ধরে যা কিছু করে, খেলে বা কোন কাজ করে তার মধ্য দিয়েই তাকে আমরা যা কিছু শিক্ষা দিতে চাই শেখাতে পারি এবং ভালভাবেই শেখাতে পারি।

শিশুর স্বাধীনতা

ছবি : শিরিন সুলতানা

শিশুর বিদ্যারম্ভ মানে শিশুর হাতে খড়ি। 'হাতে খড়ি' কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল হাতে খড়িমাটি বা চক দেওয়া অর্থাৎ লিখতে দেওয়া। প্রাচীনকালে নানা বর্ণের কালি দিয়ে ভূর্জপাতা, তালপাতা, কলাপাতা ইত্যাদিতে লেখা হত বলে লিপির এক নাম বর্ণ হয়েছে। এখন, এই বর্ণ পরিচয় শিশুকে কোন্ পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয়? এ ব্যাপারে বিভিন্ন প্রচলিত পদ্ধতি সম্পর্কে আগে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক :

১। বিশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ প্রণালী : যে সকল সরল ও বক্ররেখার সাহায্যে এক একটি বর্ণ গঠিত হয়েছে, সেই বর্ণগুলিকে বিশ্লেষণ করে শিশুকে প্রথমে সেই রেখাগুলি আঁকতে শেখানো হয়। পরে সেগুলি সংশ্লেষণ করে বর্ণটি গঠন করে লিখতে ও পড়তে শেখানো হয়। এই পদ্ধতির দোষ হল রেখা-অঙ্কন থেকে বর্ণ লেখা ও পড়া পর্যন্ত সকল কাজই শিশু যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন করে। এতে সে কোন আনন্দই পায় না; এর কোন অর্থও সে খুঁজে পায় না। কারণ, শিশুর নিকট রেখা বা বর্ণের কোন অর্থ নেই।

২। বর্ণনানুক্রমিক পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে প্রথমে একেকটি করে সকল বর্ণ পড়তে ও লিখতে দেওয়া হয়, পরে বিভিন্ন বর্ণের সাহায্যে এক একটি শব্দ গঠন করে তা পড়তে ও লিখতে শিখানো হয়। আমাদের দেশে আবহমানকাল থেকে এই পদ্ধতিই প্রচলিত আছে। কিন্তু এ পদ্ধতি মোটেই শিশু মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়। কারণ শিশুর নিকট একেকটি বর্ণের কোন অর্থ নেই। সে কখনও মায়ের মুখে বর্ণ উচ্চারণ করতে শেখেনি, সে শিখেছে একটি বাক্যাংশ বা পূর্ণ বাক্য। ফলে এ পদ্ধতিতে বর্ণ শিক্ষা তার নিকট অত্যন্ত নিরস ও কষ্টসাধ্য বোধ হয় এবং এর জন্য দীর্ঘ সময় ব্যয়িত হয়।

৩। শব্দ ক্রমিক পদ্ধতি :- এই পদ্ধতিতে শিশুকে প্রথমে একেকটি সহজ শব্দ শিক্ষা দিয়ে পরে তাদের অন্তর্গত বিভিন্ন বর্ণ শিক্ষা দেওয়া হয়। এ পদ্ধতি শিশুর নিকট অনেকটা আনন্দজনক, কারণ শব্দগুলির অর্থ সে বোঝে।

(৭ম পৃঃ দ্রঃ)

দৈনিক ইত্তেফাক

15+B

তারিখ 02 FEB 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিশুর বিদ্যালয়ে গমন

(৫ম পৃঃ পর)

কিন্তু তবু এ পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি বলা যায় না। কারণ শিশু কখনও একটি শব্দ বলতে শেখে না, সে যখন আধো আধোভাবে কথা বলে, তখন আপাতঃদৃষ্টিতে সে একটি শব্দ উচ্চারণ করে বলেই মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। সে যখন বলে, 'মা দুধ'। তখন সে একটি পূর্ণ বাক্যই বলে অর্থাৎ সে বলে 'মা আমার ক্ষিধে পেয়েছে, আমাকে দুধ খেতে দাও।

৪। বাক্য ক্রমিক পদ্ধতি :- পূর্বেই বলা হয়েছে শিশু কখনও একটি শব্দ বলে না, সে বলে একটি পূর্ণভাব প্রকাশক বাক্য—যদিও সে প্রথম অবস্থায় তা পূর্ণরূপে পরিস্ফুট করতে পারে না। শিশু যখন বিদ্যালয়ে এসেছে, তখন সে ছোট ছোট বাক্যের সাহায্যে কথা বলতে শিখেছে। সুতরাং পূণ বাক্যতে অর্থ পরিস্ফুট হওয়াতে শিশু সেই বাক্য পড়তে ও লিখতে আনন্দ ও আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। যে জিনিসে শিশুরা আনন্দ পায়, অর্থ খুঁজে পায়, সেই জিনিস আয়ত্ত করতেও তারা আনন্দ পায় এবং স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। প্রশ্ন উঠতে পারে, শিশুরা বর্ণ না শিখেই বাক্য ও শব্দ পড়বে কেমন করে? শিশু যেমন ছবি দেখে ছবিটি মনে করে রাখে সেইরূপ সমগ্র বাক্যটির দৃশ্যরূপ দেখে সমগ্র বাক্যটিই শিশু মনে করে রাখতে পারে। তারপর শিশু বাক্যের অন্তর্গত শব্দ ও বর্ণ সহজেই শিখতে পারবে। এই সত্যটি প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি চীনদেশে সুদূর খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ যুগেই অনুধাবন করতে পেরেছিল। তাই তারা বর্ণ নয়, আবিষ্কার করেছিল একেকটি চিত্রবৎ চিহ্ন, যার প্রত্যেকটি হয় একটি বাক্যাংশ নতুবা পূর্ণ বাক্য। আর তার অর্থ চীন দেশের শিশুরা বোঝে বলে অতিসহজেই আয়ত্ত করতে পারে। কিন্তু আমাদের কাছে ঐ চিত্রবৎ চিহ্নগুলি কি কঠিনই না মনে হয়।

উপরোল্লিখিত পদ্ধতি ছাড়া আরও রয়েছে (৫) ফোনে টিক পদ্ধতি, (৬) দ্বৈত পদ্ধতি, (৭) দেখা ও বলা পদ্ধতি ইত্যাদি।

কিন্তু কোন পদ্ধতিই শিশুর লেখা ও পড়া শেখানোর ব্যাপারে স্বয়ংসিদ্ধ নয়। (ক্রমশঃ)

দৈনিক ইনকিলাব

15C

তারিখ ... 16 FEB 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ...

শিশুর চারিত্রিক বিকাশের মূল লক্ষ্য

শামস আফরোজ

শিশুকে অফুট কলিসম বিবেচনা করে সযত্ন স্নেহ লালনে তাকে মানুষ করে তুলতে হবে। একজন সৎ আত্মসংযমী বুদ্ধিদীপ্ত নানান মানবিক গুণ শিশুর মধ্যে সঞ্চারিত করে গড়ে তোলার পেছনে থাকা মা ও শিক্ষকদের অকুণ্ঠ আত্মত্যাগ ও আত্মসংযম এবং অধ্যাবসায়। আপনার শিশুর চরিত্র বিকাশের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও পরিকল্পনা, সত্য নিষ্ঠতা, আত্মবিশ্বাস, ক্ষমাগুণ, সংসাহস এসব গুণাবলীর বিকাশ একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। জ্ঞানের ক্ষেত্র প্রসার হলে মস্তিষ্কের বিকাশ হবে সত্যি, কিন্তু হৃদয়বৃত্তি বিকাশের জন্য চাই শিশুর মধ্যে ধর্মবোধ জাগ্রত করা। বর্তমান বিশ্বের তাণ্ডবতা ও ধ্বংসাত্মক তথা সমাজ জাতি বিধ্বংসী কার্যকলাপের মূলে রয়েছে মানুষের প্রতি মানুষের আস্থা ও ধর্মবোধের অভাব। ধর্ম মানুষকে নৈতিক দিক দিয়ে রক্ষা করে। ভবিষ্যতের জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিমণ্ডল এমনভাবে সৃষ্টি করতে হবে যাতে শিশুরা আপনি অনুপ্রাণিত হয়। মুখে যতই বলা হোক সবাইকে দিয়ে ভাগ করে মিলেমিশে খাওয়া ভাল। চরিত্র বিকাশের জন্য এই শিক্ষা মাঠে-মারা যাবে, যতক্ষণ না বাপ-মা উদ্যোগী হয়ে ভাই-বোন যখন মিলেমিশে ভাগ করে খাচ্ছে তখন প্রশংসা এবং এটাই যে কাম্য এমন পরিমণ্ডল না সৃষ্টি করতে পারেন। সৎ দৃষ্টান্ত আমরা বলে থাকি, কয়জন অনুসরণ করি? আসলে কিন্তু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, শিশুরা বহুল পরিমাণে কু-অভ্যাস অথবা কু-আচরণ এতবেশী দেখে যে তা পরে মজ্জাগত ও বদ আচরণের প্রতি সহজাত স্বাভাবিক আকর্ষণ জন্মে যায়। তখন আর কোন কিছুই আদৌ খারাপ বলে মনে হয় না। এখন আমাদের দেশে খবরের পাতা খুললেই স্বাভাবিক রাহাজানি, প্রতারণা, এসিড নিক্ষেপ অতি স্বাভাবিক হয়ে গেছে। যারা এসব ঘটনার নায়ক তারাও মাত্র গতকালকেই তাদের কৈশর সীমা অতিক্রম করেছে। আমি বলবো এই ধরনের কাজে উৎসাহ শিশুরা প্রথমে বাড়ী এবং পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের ফলে পেয়ে থাকে। তা ধীরে ধীরে মজ্জাগত হয়ে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিকভাবে মানবেতর পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়।

মাতা যদি দেখেন কোন ছোট্ট শিশু তার কচি দু'হাত বাড়িয়ে অসুস্থ ছাগল ছানাটিকে আদর করছে বা দুধ খেতে সাহায্য করছে তখন শিশুটির প্রশংসা করে বলা উচিত মণি তুমি কতভালো খুব সুন্দর তোমার মন, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ শক্তির মত শিশুটির মনে কাজ করবে ও তাকে অনুপ্রাণিত করবে। কোন চোর যদি গণপিটুনীতে নাকানি চুবানি খাচ্ছে তখন যদি কোন মাতা তার শিশুটিকে দেখিয়ে বলেন দেখেছো মণি চোরদের কি কষ্ট কি রকম মার খাচ্ছে চুরি করা ভাল নয়। তার শিশুর মনে তা মন্ত্রশক্তির মতই কাজ করবে। চুরি করা যে খারাপ একথা তা মজ্জাগত হয়ে যাবে ও চোরদের প্রতি ঘৃণা জন্মাবে।

উচ্চাদর্শ শিক্ষণের প্রথম সোপানটি রচিত হয় হৃদয়বতী মায়েদের হাতে। ধরুন কোন কারণবশতঃ আপনার শিশুটি মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, মিথ্যা বলা যে ভাল নয় সে জ্ঞান তার নাও থাকতে পারে সে ক্ষেত্রে মায়েদের সত্যনিষ্ঠতাও মিথ্যার মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে তাকে আত্মপ্রত্যয়ের পথে নিয়ে যেতে হবে। তাহলে সে বুঝতে পারবে মিথ্যা বলা ঠিক নয়। অতিক্রত হয়ত ঠিক হবে না কিছুই তবে মিথ্যা বলার পর সে লজ্জিত হবে এবং ধীরে ধীরে সত্য ও সততার প্রতি অনুরাগ জন্মাবে। কারণ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে অসন্তোষের দ্বন্দ্বই তাকে নিচ আদর্শের মধ্য থেকে উচ্চ আদর্শের দিকে ঠেলে দিবে।

শিশু যখন পড়তে শিখবে তা কল্পনা শক্তি রূপকথার গল্পের মাধ্যমে আশ্রয় খুঁজে পাবে। ও গল্পের রাজপুত্তরের মতই সৎসাহসী হবার প্রেরণার বীজের সুপ্তি ঘটবে। আদর্শ নীতি, গল্প সম্বলিত শিক্ষার বইয়ের গল্প শিশুকে উদার, সৎ ও মননশীল হতে সাহায্য করবে। আজকাল

আমরা শিশুদের নিয়ে সিনেমা অথবা টিভিতে ছায়াছবির অশ্লীল উত্তেজক মুহূর্তগুলো দেখতে দ্বিধাবোধ করি না।

অসমাপ্ত

দৈনিক ইত্তেফাক

15-D

তারিখ 09 FEB 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিশুর বিদ্যালয় গমন ও শিক্ষকের ভূমিকা

ড: মালিহা খাতুন

(শেষাংশ)

তাহলে কিভাবে শিশুর হাতে-খড়ি ও বর্ণ পরিচয় হবে ? নিম্নে সে বিষয়ে অতি সংক্ষেপে সামান্য আলোকপাত করা হল :

ক) লেখা শেখানোর পৌর্বাহ্নিক প্রস্তুতি :

১। শিশু ভালবাসে রংচংঙ। তাই প্রথমেই রং-তুলি, রঙিন পেন্সিল, রঙ্গিন চক শিশুদের হাতে তুলে দিতে হবে। এতে তারা এলোমেলো ও ক্রমে স্পষ্ট রেখার দ্বারা ছবি আঁকতে শুরু করবে। কাগজের ওপর ক্রমশঃ তাদের মনের রং ও রেখা স্পষ্ট হতে থাকবে এবং রং ও রেখায় তাদের মন দল মেলে পূর্ণতা ও স্পষ্টতার দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। শিশুর মনে কত রঙ আছে, তা শিক্ষককে বুঝতে হবে এবং কথায় গল্পে একটি রঙ্গিন কল্প জগতে তাদেরকে নিয়ে যেতে হবে। কারণ শিশুরা স্বভাব কবি, স্বভাব শিল্পী।

২। শিশুর প্রথম পাঠ পর্বে একটি রুচিকর পরিবেশে সকল প্রকার সম্ভাব্য ব্যবস্থা ও সুযোগ সুবিধের সর্বোত্তম অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে। এর কারণ যেমন সুস্পষ্ট, গুরুত্বও তেমনি অপরিসীম। শিশুর মন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণাঙ্গরূপ ও বলিষ্ঠতার ওপরই জাতির ভবিষ্যৎ সর্বাংশে নির্ভর করে।

৩। বড় বড় চার্ট ও রঙ্গিন ছবির দ্বারা চিত্রিত-বিচিত্রিত করে বর্ণ পরিচয়, পরিচিত শব্দের আলেখ্য রূপ, ফল, পাতা ও পাখির চিত্তাকর্ষক ছবি, প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদির দ্বারা শ্রেণীকক্ষ এরূপ-ভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে, যাতে শিশুর দৃষ্টি চতুর্দিকে প্রায় সকল সময়ের জন্য আকৃষ্ট রেখে তাদেরকে কৌতূহলী করে তোলে।

৪। এই সব ছাড়াও, শিশুর অনুকরণপ্রিয়তার সুযোগ গ্রহণের জন্য কয়েকটি আদর্শ নমুনার চিত্তাকর্ষক চার্ট থাকবে। নমুনা চার্ট-গুলির চার প্রান্তিকে পরিচ্ছন্ন অথচ সুন্দর আল্পনা থাকবে এবং চার্টের মধ্যভাগে থাকবে রঙ্গিন ছাপার লেখা, টানা লেখা (Cursive Writing) ছাড়া ছাড়া লেখা (Non-Cursive writing), টাই লেখা, খাড়া লেখা, বাঁকা লেখা, স্ক্রিপ্ট লেখা, ক্লিপ্ট প্রিন্ট লেখা, পাণ্ডু-লিপি লেখা (Manauscript writing), বিখ্যাত লেখকদের হাতের লেখার আলোকচিত্র ইত্যাদি। এইসব নমুনার ছাঁদে শিশুরা লিখতে অনুপ্রাণিত হবে।

হাসি-খুশী

ছবি : শিরীন সুলতানা

খ) লেখা শেখানোর আধুনিক পদ্ধতিসমূহ :

১। সর্বপ্রথম শিশুকে কলম ধরে হস্ত চালনা করতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য রঙ্গিন পেন্সিল দ্বারা রেখা টেনে টেনে কাগজে আঁকা নানা জ্যামিতিক ঘর পূরণ করতে দিতে হবে। এতে সুন্দর সুন্দর ডিজাইন ফুটে উঠবে। শিশুরা এইসব কাজ আনন্দের সংগে করবে। প্রত্যেকটি রেখা ও ডিজাইন বিভিন্ন বর্ণ প্রলেপে আঁকলে যখন একেকটা শিল্পকর্ম হয়ে উঠবে, তখন তাদের শিল্পী বলে প্রশংসা করলে তারা অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করবে।

২। লেখার ব্যাপারে শিশুর স্বাভাবিক গতিকে অনুসরণ করে চলাই বাঞ্ছনীয়। শিশুকে যদি রঙ্গিন চক ও বোর্ড বা রঙ্গিন পেন্সিল ও খাতা দেওয়া যায় তা হলে সে সাধারণতঃ নানা রকম হিজিবিজি অংকন করে থাকে। এই হিজিবিজি কখনও বিশেষ ধারা বেয়ে চলতে থাকে এবং বর্ণ লেখার মৌলিক রেখাগুলো ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। হাতের নমনীয় পেশীগুলোও তাদের নিয়ন্ত্রণে আসতে থাকে।

৩। শিশু যখন হিজিবিজি ভেঙ্গে আঁকতে শেখে তখন তাদের পক্ষে শব্দ তৈরী করা সহজ হয়।

৪। এই পর্যায়ে শিশুদের কিছু লিখতে বললে তারা স্যার বা আপাকে বলে থাকে, আমি একটি প্রজাপতি লিখব, ফড়িং লিখব, পাখি লিখব, মাছ লিখব ইত্যাদি। স্যার বা আপা বলবেন, তোমরা যা খুশি তাই লেখ। তাদের লেখা শেষ হয়ে গেলে খাতা দেখলে দেখা যাবে, তারা যা কিছু লিখেছে তার সবই প্রায় গোল। এর কারণ কি ?

৫। কারণ আর কিছুই নয়, শিশু মনস্তত্ত্ব অনুসরণ করে বলা যায়, বাঁ থেকে ডানে এবং ডান থেকে বাঁয়ে বৃত্ত আঁকার প্রবণতাই তাদের বেশী। ওপর থেকে নীচে, বা থেকে ডানে সরল রেখা টানার প্রবণতাও কারো কারো মধ্যে দেখা যাবে। শিশু মনের এই প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানভিত্তিক বর্ণমালা তৈরী করেছিলেন। তাই শিশুদের বৃত্ত এঁকে দিয়ে ডান থেকে বাঁয়ে এবং বাঁ থেকে ডানে বৃত্ত করে ভিতরের অংশ পূরণ করতে দেয়া উচিত। কারণ, ডান থেকে বাঁয়ে বৃত্ত এবং সেই সঙ্গে সরল রেখার সংযোগে যে অক্ষরগুলো লেখা যায়, তা হল—অ, আ, ত, ও, ঐ, এ, ঐ, ঞ, গ, প, স, ন, ম, ল, দ, (একটু বাঁকা করলেই ড ড় উ ঊ, জ, অংকের ৬ সংখ্যা), য য়, ষ, ফ (অংকের ২ সংখ্যা) হ ই, (খ অংকের ২ সংখ্যা)। আবার বাঁ থেকে ডানে বৃত্ত এবং সরল রেখার সংযোগে লেখা যায় চ ঢ় ট ঠ চ, ছ ব, র, ক ধ ঝ দুই প্রকার বৃত্তের মিশ্রণে শেখা যায় ভ, খ, শ।

৬। শিশু মনস্তত্ত্ব অনুসরণ করে দেখা গেছে শিশুরা সমগ্র বিষয়টি একবারে শিক্ষা করে থাকে শব্দক্রমিক, বাক্যক্রমিক, দৈত দেখা ও বলা ছড়া ও ছবি—পড়া বিষয়ে যে পদ্ধতিই শিশুরা অনুসরণ করুক না কেন শিক্ষকের শেখা বাক্যের দৃশ্যরূপ দেখেই শিশুরা তা লিখতে শেখে।

৭। শিশুর কাছে আলাদা অক্ষরের কোন অর্থ নেই, তার কাছে শব্দ ও পূর্ণ বাক্যের অর্থ আছে। বর্ণ যখন শব্দে বা বাক্যে স্থান পায়, তখন বর্ণটি শিখতে তার

(৭ম পৃঃ দ্রঃ)